কৃষি উৎপাদনের মৌলনীতি

ইউনিট ১

ভূমিকা

অর্থনৈতিকভাবে যে সব উদ্ভিদ বা গাছপালা গুরুত্ব পূর্ণ সেগুলোই মানুষ তার জীবন ও জীবিকা পরিচালনার জন্য চাষাবাদ করে থাকে। ফসলের সাথে পরিচিতি বিভিন্ন ফসলের ব্যবস্থাপনা, তাদের অভিযোজন, জলবায়ু, বৃদ্ধির ধরণ, জন্মানো মৌসুম এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য ফসলের শ্রেণিবিভাগ প্রয়োজন। সফলভাবে কৃষিজ উৎপাদনের জন্য কর্ষণ, সার ব্যবস্থাপনা, বীজের গুনাগুন, ফসল পরিচর্যা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আধুণিক এ প্রযুক্তি প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। এই ইউনিটে ফসলের শ্রেণিবিভাগ উৎপাদন মৌসুম, কর্ষন, সার ব্যবস্থঅপনা, বীজের গুণাগুণ, ফসল পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১.১ : ফসলের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ
পাঠ - ১.২ : ফসল উৎপাদন মৌসুম
পাঠ - ১.৩ : কর্ষণ ও সার ব্যবস্থাপনা
পাঠ - ১.৪ : বীজের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ
পাঠ - ১.৫ : ফসল পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
পাঠ - ১.৬ : ব্যবহারিক: সবুজ সার তৈরি
পাঠ - ১.৭ : ব্যবহারিক: বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

পাঠ-১.১ ফসলের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফসলের শ্রেণিবিভাগ এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- ফসলের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন যেসব উদ্ভিদ বা গাছপালা মানুষ তার জীবন ও জীবিকা পরিচালনার জন্য চাষাবাদ করেন ফসল। সেগুলোকে অর্থাৎ জমিতে জন্মানো সব উদ্ভিদ ফসল নয় তাই মানুষের প্রয়োজনে যন্তের সাথে চাষ করে সেগুলোকেই ফসল বলে। ফসল বা শস্য সর্ম্পকিত বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানার্জন আবশ্যক। ফসলের বিভিন্ন জাত সমূহের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য, বিস্তৃতি, সাধারন জ্ঞান ইত্যাদির সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন, যা ফসলের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়তা করবে। সাধারনত নিম্নলিখিত কারণে ফসলের শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ:

১. ফসলের সাথে পরিচিত হওয়া।
২. বিভিন্ন ধরনের ফসলে মাটির ও পানির চাহিদা সর্ম্পকে জানা।
৩. কোনো ফসলের নতুন পরিবেশে অভিযোজন সম্পর্কে জানা।
৪. ফসলের বৃদ্ধির ধরন বা স্বভাব জানা।
৫. বিভিন্ন ফসলের জলবায়ুর প্রয়োজনীয়তা জানা।
৬. বিভিন্ন ফসল এবং তার ব্যবহার সর্ম্পকিত অর্থনৈতিক গুরুত্ব জানা।
৭. ফসলের জন্মানোর মৌসুম সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৮. কোন ফসলে কি ধরনের চাষ বা চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা জানা।

কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানের আলোকে বিভিন্নভাবে মাঠ ফসলের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. কৃষিতাত্ত্বিক উপায়ে

ক. দানাজাতীয় ফসল: গ্রামিনী (Gramineae) বা ঘাস পরিবারের সদস্য যাদের আহারোপযোগী দানার জন্য উৎপাদন করা হয়। যেমন: ধান, গম, বাজরা, ভূট্টা, যব, জোয়ার, চীনা, কাউন ইত্যাদি।
খ. ডাল ফসল: ডালের জন্য যে সকল দানা চাষ করা হয়। যেমন: মসুর, মুগ, ছোলা, খেসারী ইত্যাদি।
গ. চিনি ফসল: যে সকল ফসল রস চিনি, গুড় ইত্যাদি মিষ্টি জাতীয় পদার্থ উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়। যেমন: আখ, বীট ইত্যাদি।
ঘ. তৈলবীজ ফসল: যে সকল ফসলের বীজ থেকে তৈল সংগ্রহ করা হয়। যেমন: সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সয়াবীন ইত্যাদি।
ঙ. আঁশ ফসল: যে সকল ফসল হতে আঁশ পাওয়া যায়। যেমন: তুলা, পাট. কেনাফ ইত্যাদি।
চ. পশুখাদ্য ফসল: যে সকল ফসল পশু খাদ্য হিসাবে জন্মানো হয়। যেমন: ভূট্টা, সরগাম, নেপিয়ার ঘাস, আলফা আলফা ইত্যাদি।
ছ. মূল জাতীয় ফসল: যে সকল ফসলের রুপান্তরিত মূল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: মিষ্টি আলু, সুগারবীট ইত্যাদি।
জ. নেশা জাতীয় ফসল: যে সকল ফসল নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়। যেমন: তামাক, কফি, চা ইত্যাদি।

২. উৎপাদনের মৌসুম অনুযায়ী

ক. রবি শস্য: বোরো ধান, গম, সরিষা, ডাল জাতীয় ফসল যেমন মসুর, ছোলা ইত্যাদি।

খ. খরিপ শস্য: (১) খরিপ-১ শস্য- আউশ ধান, পাট, ভূট্টা ইত্যাদি।
(২) খরিপ-২ শস্য - আমন ধান, সূর্যমুখী, সয়াবীন ইত্যাদি।
গ. উভয় মৌসুম শস্য: তিল, কাউন, ভূট্টা, চীনাবাদাম ইত্যাদি।

৩. জীবণকালের ভিত্তিতে

ক. একবর্ষী ফসল: ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি।
খ. দ্বি-বর্ষী ফসল: সুগারবীট, পেয়াঁজ, গাজর ইত্যাদি।
গ. বহু বর্ষী ফসল: আখ, চা, কফি ইত্যাদি।

৪. পরাগায়নের ভিত্তিতে

ক. স্ব-পরাগী : ধান, গম, তামাক ইত্যাদি।
খ. পর- পরাগী : সরিষা, ভূট্টা, গাজর ইত্যাদি।
গ. স্ব ও পর- পরাগী: তুলা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

৫. ফুল উৎপাদনে দিনের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে

ক. খাটো দিবস ফসল: আমন ধান, পাট, আখ ইত্যাদি।
খ. দীর্ঘ দিবস ফসল: সুগার বীট, বাধাঁকপি ইত্যাদি।
গ. দিন নিরপেক্ষ ফসল: সয়াবীন, ভূট্টা, আউশ ধান ইত্যাদি।

৬. বীজপত্রের সংখ্যার ও পরিবার ভিত্তিতে

ক. এক বীজপত্রী ফসল: যে সকল ফসলের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে প্রাথমিকভাবে একটি মাত্র বীজপত্র উৎপন্ন করে থাকে।

১. গ্রামিনী বা ঘাস পরিবারের ফসল: ধান, গম, ভূট্টা, কাউন ইত্যাদি।
২. লিলিয়েসি পরিবারের ফসল: পেয়াঁজ, রসুন ইত্যাদি।

খ. দ্বি বীজপত্রী ফসল: যে সকল ফসলের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে প্রাথমিকভাবে দু'টি বীজপত্র উৎপন্ন করে থাকে।

১. লিগুমিনোসি বা ডাল পরিবারের ফসল: মসুর, ছোলা ইত্যাদি।
২. মালভেসি পরিবারের ফসল: কেনাফ, তুলা ইত্যাদি।
৩. সোলানেসি পরিবারের ফসল: তামাক, আলু ইত্যাদি।
৪. টিলিয়েসি পরিবারের ফসল: পাট।
৫. ক্রুসিফেরি পরিবারের ফসল: সরিষা, সূর্যমুখি ইত্যাদি।

৭. অভিযোজন তাপমাত্রার ভিত্তিতে

ক. উষ্ণ জলবায়ুর ফসল: আখ, পাট, ধান ইত্যাদি।
খ. অবউষ্ণ জলবায়ুর ফসল: মসুর, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি।
গ. শীতল জলবায়ুর ফসল: গম, যব, সুগারবীট ইত্যাদি।

৮. ফসলের বিশেষ শ্রেণীবিভাগ

ক. অন্ত:বর্তী ফসল: যে সকল ফসল স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট এবং বছরের প্রধান দুটো ফসলের অন্ত:বর্তী কালীন অল্প সময়ে চাষ করা যায় যেমন: চীনা বা কাউন, ক্লোভার ইত্যাদি।

খ. অর্থকরী ফসল: সাধারনত যে সকল ফসল বিক্রি করে কৃষক তার অনান্য খরচের যোগান দেয় যেমন: তামাক, পাট ইত্যাদি।

গ. আচ্ছাদন ফসল: ভূমিক্ষয় হতে জমি রক্ষার জন্য যে সকল ফসল দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয় যেমন: চীনাবাদাম, ক্লোভার ইত্যাদি।

ঘ. সাথী ফসল: একই জমিতে দুইটি ফসল চাষ করা হয় এবং একটির জীবনচক্র শেষ হওয়ার পূর্বেই অন্যটি ঐ জমিতে বপন করা হয় যেমন: আমন ধানের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে খেসারির চাষ করা হয়।

ঙ. সবুজ সার ফসল: যে সকল সবুজ শস্য মাটিতে মিশিয়ে জৈব সার তৈরী করা হয়। যেমন: ধইঞ্চা, শনপাট ইত্যাদি।

চ. সাইলেজ ফসল: যে সকল গাছ নরম ও রসালো অবস্থায় বিশেষভাবে বায়ুরোধি করে গাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশু খাদ্য হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন: ভূট্টা, সরগাম, ডাল জাতীয় ফসল ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ফসলের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করবে

সারসংক্ষেপ

ফসল সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। ফসল পরিচিতি, বিভিন্ন ফসলের ব্যবস্থাপনা, অভিযোজন, জলবায়ু বৃদ্ধির ধরণ, মৌসুম এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য ফসলের শ্রেণিবিভাগ গরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন

১. কোন্‌টি মূল জাতীয় ফসল?
   (ক) আলু (খ) পেয়াঁজ
   (গ) মিষ্টি আলু (ঘ) আদা

২. কোন্‌টি দ্বি-বর্ষী ফসল?
   (ক) ভূট্টা (খ) সুগারবীট
   (গ) চা (ঘ) কফি

৩. কোন্‌টি খাটো দিবসের ফসল?
   (ক) আমন ধান (খ) আউশ ধান
   (গ) সয়াবিন (ঘ) বাধাঁকপি

৪. কোনটি টিলিয়েসি পরিবারের ফসল?
   (ক) পাট (খ) কেনাফ
   (গ) তুলা (ঘ) তামাক

৫. কোন্‌টি সাথী ফসল?
   (ক) আলু (খ) যব
   (গ) খেসারি (ঘ) ধৈঞ্চা

৬. কোন্‌টি স্ব-পরাগী ফসল?
   (ক) সরিষা (খ) লাউ
   (গ) ভূট্টা (ঘ) তামাক

পাঠ-১.২ ফসল উৎপাদন মৌসুম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফসল উৎপাদন মৌসুম কি তা বলতে পারবেন।
- ফসল উৎপাদন মৌসুম গুলি জানতে পারবেন।
- ফসল চাষে - বারো মাসের পঞ্জিকা সম্পর্কে ধারনা পারবেন।

একটি ফসল বীজ বপন থেকে শুরু করে তার শারিরিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে যে সময় নেয় তাকে ঐ ফসলের উৎপাদন মৌসুম বলে।

ফসল উৎপাদনের জন্য পুরো বছরকে দুইটি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) রবি মৌসুম ও (২) খরিপ মৌসুম।

(১) রবি মৌসুম: কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন মাস (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য মার্চ) পর্যন্ত সময়কে রবি মৌসুম বলা হয়। এ সময় মৌসুমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কম থাকে। বৃষ্টিপাত ও শীলাবৃষ্টি কম হয়। বন্যার আশঙ্কা কম থাকে এবং পানি সেচের প্রয়োজন হয়। এ মৌসুমে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম থাকে। দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্য থেকে ছোট বা সমান হয়ে থাকে।

রবি মৌসুমের ফসল:

(ক) দানা শস্য: বোরো ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি।
(খ) তৈলবীজ: সরিষা, তিল, চীনাবাদাম ইত্যাদি।
(গ) ডালজাতীয় ফসল: মসুর, মটর, মুগ, বরবটি ইত্যাদি।
(ঘ) শীতকালীন শাকসবজি: বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, টমেটো ইত্যাদি।
(ঙ) কন্দ ও মূল জাতীয় ফসল: আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

(২) খরিপ মৌসুম

খরিপ মৌসুমকে পুনরায় দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **খরিপ-১:** চৈত্র মাস থেকে আষাঢ় মাস (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুলাই) পর্যন্ত সময়কাল খরিপ-১ এর অর্ন্তভূক্ত। এই সময়কালকে গ্রীষ্মকালও বলা হয়। এ সময় তাপমাত্রা বেশী থাকে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হয়।

(খ) **খরিপ-২:** শ্রাবণ মাস থেকে আশ্বিন মাস (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য অক্টোবর) পর্যন্ত সময়কাল খরিপ-২ এর অর্ন্তভূক্ত। এ মৌসুমে আর্দ্রতা বেশী থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এ মৌসুমকে তাই বর্ষাকাল বলে। এ মৌসুমে ফসলে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই বেশি আক্রমন করে।

খরিপ মৌসুমের ফসল:

(ক) দানা শস্য: বোনা ও রোপা আউশ, রোপা আমন, চীনা, কাউন ইত্যাদি।
(খ) তৈল জাতীয়: তিল, চীনাবাদাম, সয়াবিন ইত্যাদি।
(গ) ডাল জাতীয় ফসল: মুগ, মাসকালাই, অড়হর ইত্যাদি।
(ঘ) আঁশ জাতীয় ফসল: পাট, তুলা, কেনাফ ইত্যাদি।
(ঙ) গ্রীষ্মকালীন সবজি: ঢেড়ঁস, পুঁইশাক, মিষ্টিকুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি।

ছকে রবি এবং খরিপ শস্যের পার্থক্য:

রবি শস্য	খরিপ শস্য
১. উৎপাদন মৌসুম মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য মার্চ।	১. উৎপাদন মৌসুম মধ্য মার্চ থেকে মধ্য অক্টোবর।
২. বীজ বর্ষা শেষে অর্থাৎ শীত মৌসুমে বপন করা হয় এবং ফসল উৎপাদন সেচ নির্ভর।	২. বীজ বর্ষার শুরুতে বপন করা হয় এবং ফসল উৎপাদন বৃষ্টি নির্ভর।
৩. বীজের অঙ্কুরোদগম ও গাছের বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া প্রয়োজন।	৩. বীজের অঙ্কুরোদগম ও গাছের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া প্রয়োজন।
৪. দীর্ঘ দিবস দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়।	৪. স্বল্প দিবস দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়।
৫. প্রধান ফসল বোরো ধান, গম, সরিষা, আলু ইত্যাদি।	৫. প্রধান ফসল বোনা ও রোপা আউশ, রোপা আমন, পাট, তুলা, সয়াবিন ইত্যাদি।

ফসল চাষে বারো মাসের পঞ্জিকা:

বৈশাখ (মধ্য এপ্রিল - মধ্য মে): শুরুতেই বোনা ও রোপা আউশ ধান ও পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় চাষ দিয়ে জমি প্রস্তুত করাসহ বীজ বপনের কাজ শেষ করতে হবে। লালশাক, ডাঁটা, পাটশাক, বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়স এর বীজ বপনের উত্তম সময়। গ্রীষ্মকালীন টমেটো, মিষ্টিকুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা, শশার চারা উৎপাদন করতে হবে। খরিপ-১ সবজির বীজ বপন, চারা রোপন এবং খরিপ-২ সবজির বীজতলা প্রস্তুত ও চারা তৈরী করতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ (মধ্য মে- মধ্য জুন): আউশের জমিতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যাসহ সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজতলায় বপনকৃত খরিপ-২ এর সবজির চারা রোপন, সেচ ও সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করতে হবে। কুমড়া জাতীয় সবজির পোকা মাকড় দমন এবং প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করতে হবে।

আষাঢ় (মধ্য জুন- মধ্য জুলাই): আউশের জমিতে রোগ বালাই পর্যবেক্ষণসহ পরিচর্যা এবং ফসল সংগ্রহ করতে হবে। শুরুতেই প্রয়োজনীয় চাষ দ্বারা আমন বীজতলা তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন সবজির পোকামাকড়, রোগবালাই দমন। আগাম সবজি ফসল সংগ্রহ করতে হবে। খরিপ-২ সবজির চারা রোপন ও পরিচর্যা, সেচ এবং সার প্রয়োগ করতে হবে।

শ্রাবণ (মধ্য জুলাই- মধ্য আগষ্ট): আমনের জমিতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যাসহ সার প্রয়োগ করতে হবে। আগাম রবি সবজি চাষের জন্য বীজতলা তৈরী ও বীজ বপন করতে হবে। খরিপ-২ সবজি উঠানো এবং পোকামাকড় দমন করতে হবে।

ভাদ্র (মধ্য আগষ্ট - মধ্য সেপ্টেম্বর): আমনের জমিতে পরিচর্যা, সার এবং প্রয়োজনীয় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। পাট কর্তন ও সংরক্ষণ করতে হবে। অধিকাংশ খরিপ-২ সবজি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও খরিপ -১ এর সবজি বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। আগাম রবি সবজির জন্য জমি তৈরী, চারা রোপন এবং সার প্রয়োগ করতে হবে।

আশ্বিন (মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য অক্টোবর): আগাম রবি সবজির চারা রোপন, চারার যত্ন, সেচ, সার প্রয়োগ, বালাই দমন, নাবী রবি সবজির জন্য বীজতলা তৈরী ও বীজ বপন করতে হবে। রসুন, পেঁয়াজের বীজ বপন এবং আলু চাষের জন্য জমি তৈরী ও আলু লাগাতে হবে।

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর): আমনের জমিতে রোগ বালাই পর্যবেক্ষণসহ পরিচর্যা এবং ফসল সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। গম চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ এবং সরিষার বীজ বপন করতে হবে। রবি সবজির পরিচর্যা এবং সংগ্রহ করতে হবে।

অগ্রহায়ন (মধ্য নভেম্বর - মধ্য ডিসেম্বর): আমন ধান কর্তন ও সংরক্ষণ এবং বোরো ধানের বীজতলা তৈরীর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় চাষ দ্বারা বোরো ধানের জমি তৈরী করতে হবে এবং চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গমের বীজ বপন, সার প্রয়োগ এবং সেচ প্রদান করতে হবে। মিষ্টি আলুর লতা রোপন, পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচের চারা রোপন, আলুর জমিতে সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান করতে হবে।

পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর - মধ্য জানুয়ারী): বোরো ধান, গম এবং তৈল জাতীয় ফসলের জমিতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা সহ সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে হবে। আগাম ও নাবী রবি সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন, সবজি সংগ্রহ করতে হবে।

মাঘ (মধ্য জানুয়ারী - মধ্য ফেব্রুয়ারী): বোরো ধান, গম ফসলের জমিতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা সহ, রোগ বালাই দমন, সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে হবে। সরিষা উত্তোলনসহ, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ফসলের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়াসহ সার, সেচ প্রয়োগ করতে হবে। আগাম খরিপ-১ সবজির বীজতলা তৈরী বা মাদা তৈরী বা বীজ বপন এর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারী - মধ্য মার্চ): পাট চাষের জন্য জমি নির্বাচনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক চাষ দিয়ে জমি তৈরীর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। গম কর্তন, সংরক্ষণ ও আলু উৎত্তোলন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নাবী খরিপ-১ সবজির বীজতলা তৈরী, মাদা তৈরী, বীজ বপন এবং আগাম খরিপ-১ সবজির চারা উৎপাদন ও মূল জমি তৈরী, সার প্রয়োগ ও রোপন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চৈত্র (মধ্য মার্চ - মধ্য এপ্রিল): পাট বীজ বপন এবং বোরো ধান কর্তন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রীষ্মকালনি বেগুন, টমেটো, মরিচ এর বীজ বপন বা রোপন করতে হবে। সবজি ক্ষেতের আগাছা দমন, সেচ, সার প্রয়োগ, পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন এবং নাবী রবি সবজি উঠানো, বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ফসল চাষের বিভিন্ন মৌসুম সম্পর্কে প্রতিবেদন দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ফসল উৎপাদন মৌসুমকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) রবি মৌসুম (২) খরিপ মৌসুম। মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য মার্চ সময় পর্যন্ত রবি মৌসুম। মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুলাই পর্যন্ত খরিপ-১ এবং মধ্য জুলাই থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত খরিপ-২ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তেরর পাশে (√) টিক চিহ্ন

১. ফসল উৎপাদন মৌসুম কয়টি?
   (ক) ৩ (খ) ২
   (গ) ৪ (ঘ) ১

২. কোন্‌টি রবি মৌসুম?
   (ক) মধ্য জুলাই থেকে মধ্য অক্টোবর (খ) চৈত্র মাস থেকে আষাঢ় মাস
   (গ) কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন মাস (ঘ) কোনটিই নয়

৩. কোন্‌টি খরিপ ফসল?
   (ক) বোরো ধান (খ) গম
   (গ) সয়াবিন (ঘ) আলু

৪. কোন্‌টি রবি ফসল?
   (ক) ঢেড়ঁশ (খ) আউশ ধান
   (গ) টমেটো (ঘ) করলা

পাঠ-১.৩ কর্ষণ ও সার ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমি কর্ষণের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য জানতে পরবেন।
- ভূমি কর্ষণের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের সারের পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সারের প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমি কর্ষণ:

শস্য ও বীজ মাটিতে সুষ্ঠুভাবে বপন ও তার অঙ্কুরোদগম, চারা রোপণ এবং গাছের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য মাটিতে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অনুকূল অবস্থা তৈরীর জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি দ্বারা মাটির আলোড়ন করাকে ভূমি কর্ষণ বলা হয়। অর্থাৎ মাটিতে চাষ দিয়ে ফসল উৎপাদন বা চাষাবাদের অনুকূল অবস্থা তৈরীকে কর্ষণ বলে।

ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য

মূলত ভূমি কর্ষণের বৃহৎ উদ্দেশ্যে হচ্ছে একটি বীজতলা তৈরী করা যা বীজের উত্তম অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে, আগাছা ধ্বংস করবে এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধির অনূকুলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুনাবলী উন্নত করবে। এগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) প্রাথমিকভাবে দৃঢ় জমাটবদ্ধ চাপা মাটি আলগা করাসহ একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় চাষ দিয়ে মাটিকে উত্তম বীজতলা তৈরী।

(খ) শুকনো জমিতে মাটির ঢিলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরা করা যাতে বীজ মাটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যেতে পারে।

(গ) আলগা করা মাটির বৃষ্টি বা সেচের পানির ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ধারন এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা বর্জন করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) মাটির বিভিন্ন উপাদান যেমন মাটি কণা, জৈব পদার্থ, উপকারী জীবাণুসমূহ, আর্দ্রতা এবং বায়ুর চলাচল ইত্যাদি নতুনভাবে বিভাজন ঘটে।

(ঙ) ফসলের অবশিষ্টাংশ, সবুজ সার ও অনান্য জৈব সার, রাসায়নিক সার ইত্যাদি মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দেওয়া ।

(চ) জমিতে সৃষ্ট ক্ষতিকারক বিভিন্ন পদার্থ দূর করা এবং পোকা-মাকড়, রোগ বালাই নিয়ন্ত্রন করা ।

(ছ) ভূমি ক্ষয়রোধের জন্য জমির উপরিভাগ সমান করে তৈরী করা।

ভূমি কর্ষণের প্রকারভেদ

ভূমি কর্ষণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। জমির ভৌত অবস্থা, ফসল মৌসুম, আর্দ্রতার পরিমান, ভূমির বন্ধুরতা এবং ফসলের ধরন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ভূমি কর্ষণের ধরন নির্ধারন করা হয়।

ভূমি কর্ষণকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় যেমন:

১. **প্রাথমিক কর্ষণ:** মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করার পর এই জমিতে পরবর্তী ফসলের বীজ বপন/রোপন বা চারা রোপনের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত কর্ষণ কাজ করা হয়, তাকে প্রাথমিক কর্ষণ বলা হয়। প্রাথমিক কর্ষণের উদ্দেশ্য মাটিকে তুলনামূলকভাবে বেশী গভীরতায় ভালোভাবে আলোড়িত করা, ফসলে অবশিষ্টাংশ ও আগাছা সমূহ মাটি নিচে মিশিয়ে দেওয়া এবং পোকা-মাকড় ধ্বংস করা।

২. **আন্তঃকর্ষণ/মাধ্যমিক কর্ষণঃ** বীজ বপন বা চারা রোপনের পর থেকে আরম্ভ করে ফসল সংগ্রহ করা পর্যন্ত এ কর্ষণ করা হয়। মূলতঃ মাটির ঢেলা গুঁড়ো করা, আগাছা পরিস্কার করা, আঁচড়া দেওয়া, গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ইত্যাদি আন্তঃকর্ষণ বা মাধ্যমিক কর্ষণের অর্ন্তগত।

ভূমি কর্ষণের পুরাতন ও নতুন ধারনার আলোকে দুটো কর্ষণ পদ্ধতি অবতারণা করা হয়েছেঃ

১. **প্রচলিত ভূমিকর্ষণ পদ্ধতিঃ** এটি আমাদের দেশে প্রচলিত চাষ পদ্ধতি, যেখানে ভূমি কর্ষণের জন্য বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি যেমন দেশী লাঙ্গল, মোল্ডবোড প্লাউ, চিসাল প্লাউ, ডিস্ক হ্যারো, রোটারি হ্যারো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারনত, প্রচলিত ভূমি কর্ষণ পদ্ধতিতে মাটিকে গভীর স্তর পর্যন্ত আলোড়িত করে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ মাটির সাথে মিশানো, আগাছা ধ্বংস করা, কীটপতঙ্গের র্লাভা বা ডিম সূর্যালোকে উন্মুক্ত করে ধ্বংস করা, এবং মাটি সমান করা হয়।

২. **রক্ষণশীল ভূমিকর্ষণ পদ্ধতিঃ** এ পদ্ধতিতে কর্ষণ সম্পন্ন করতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ন্যূনতম লাঙল চাষ ও মই দেওয়া হয়। রক্ষণশীল ভূমিকর্ষণ মূলত মাটির উপরিভাগে মাটি ক্ষয়রোধ করে, সেচের পানির অপচয় রোধ করে চুয়ানোতে সহায়তা করে। এ পদ্ধতি দ্বারা মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান বৃদ্ধি করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো হয়।

সার ব্যবস্থাপনাঃ

সার কাকে বলে

উদ্ভিদ বা ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও অধিক ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহের উদ্দেশ্যে মাটিতে প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত কিংবা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী যে সব জৈব ও অজৈব দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় তাকে সার বলে।

সার ব্যবহারের আব্যশকতা

জমিতে যখন কোন ফসল চাষ করা হয়, তখন ফসল বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ফুল-ফল উৎপাদনের পর কর্তন পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে অনবরত গ্রহণ করে থাকে। ফসল কর্তনের পর মাটি থেকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান অপসারিত হয়ে থাকে। নিবিড় ফসল চাষের ফলে মৃত্তিকা থেকে পুষ্টি উপাদানের ভান্ডার শেষ হতে বাধ্য। উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদ, জৈব সার কম পরিমানে বা একেবারেও না ব্যবহার করা, মাটি ও ফসলের সঠিক ব্যবস্থাপনা জনিত কারনেও মাটিতে পুষ্ঠি উপাদানের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সে জন্য ফসল উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের লক্ষ্যে সার প্রয়োগ আব্যশক।

সারের প্রকারভেদ

উৎসের উপর ভিত্তি করে সার প্রধানত দুই প্রকার যথাঃ

(ক) জৈব সার ও (খ) অজৈব সার বা রাসায়নিক সার

জৈব সারঃ জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত সারকে জৈব সার বলে। উদ্ভিদে ও প্রাণীর দেহাবশেষ বা বর্জ্যদ্রব্য পচিঁয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে এ সার তৈরী করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান জৈব সারগুলো হলো পশুপাখির মলমূত্র, কম্পোষ্ট, খামারজাত সার, কেঁচো সার, উদ্ভিজ্জ খৈল, সবুজ সার, জীবানু সার, ছাই ইত্যাদি।

অজৈব সারঃ অজৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত সারকে অজৈব সার বা রাসায়নিক সার বলে। এ সার গুলো রাসায়নিকভাবে শিল্পকারখানায় তৈরী করা হয় যেমন ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট (টি,এস,পি), মিউরেট অব পটাশ (এম, পি), জিপসাম ইত্যাদি।

জৈব ও অজৈব সারের মধ্যে পার্থক্য

	জৈব সার		অজৈব সার
১.	বিভিন প্রকার জৈব উৎস হতে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত সারকে জৈব সার বলে যাতে শতকরা	১.	অজৈব উৎস হতে রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদিত সারকে অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে যাতে

	জৈব সার		অজৈব সার
	হিসাবে প্রতিটি পুষ্টি উপাদান কম পরিমান থাকে।		শতকরা হিসাবে প্রতিটি পুষ্টি উপাদান বেশী পরিমান থাকে।
২.	প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে।	২.	প্রয়োজনীয় এক বা দুটি উপাদান বিদ্যমান থাকে।
৩.	কোন রাসায়নিক সংকেত নেই।	৩.	রাসায়নিক সংকেত আছে।
৪.	মাটির জৈব পদার্থের পরিমান ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।	৪.	তেমন কোন প্রভাব নেই।
৫.	মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।	৫.	তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।
৬.	ইহার উৎপাদন ব্যয় কম।	৬.	ইহার উৎপাদন ব্যয় বেশী।
৭.	জমিতে প্রয়োগ করার বেশ কিছুদিন পর ইহার পুষ্টি উপাদান গাছের গ্রহনোপযোগী হয়।	৭.	জমিতে প্রয়োগ করার অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার মধ্যস্থিত পুষ্টি উপাদান গাছের গ্রহনোপযোগী হয়।

সার প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ

কোন পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ভর করে মূলত: মৃত্তিকার প্রকার ও বৈশিষ্ট্য, সার ও ফসলের প্রকারের ওপর। সার প্রয়োগের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. ছিটানো পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে হাতে বা যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে ফসলের জমিতে সার প্রয়োগ করা হয় তাকে ছিটানো পদ্ধতি বলে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ছিটিয়ে সার প্রয়োগ করা হয়।

(ক) সরল বা মূল প্রয়োগ: ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে বীজবপন বা চারা রোপণের পূর্বে অর্থাৎ জমি তৈরী করার সময় সমস্ত জমিতে ছিটিয়ে জৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগকে মূল প্রয়োগ বলে।

(খ) চাপান প্রয়োগ: জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ফসলের সারিকে গুরুত্ব না দিয়ে ছিটিয়ে সার প্রয়োগ করাকে চাপান প্রয়োগ বলে।

(গ) পার্শ্ব প্রয়োগ: সমস্ত জমিতে সার প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র ফসলের সারিতে বা শিকড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে ছিটিয়ে সার প্রয়োগকে পার্শ্ব প্রয়োগ বলে।

২. স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতি

ফসলের সমস্ত জমিতে সার ছিটিয়ে প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র গাছের মূল বা শিকড়ের কাছাকাছি এলাকায় মাটিতে সার প্রয়োগ করাকে স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতি বলে। নিম্নলিখিত ভাবে স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হয়।

(ক) বেষ্টনী পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে গাছের চারপাশে নালা কেটে নালার তলদেশে মাটির সাথে সার মিশিয়ে প্রয়োগ করাকে বেষ্টনী পদ্ধতি বলে।

(খ) সারি পদ্ধতি: অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের সারিতে জন্মানো ফসলের দুই সারির মাঝ বরাবর নালা কেটে নালার মাটির সাথে ভালোভাবে সার মিশিয়ে দেওয়াকে সারি পদ্ধতি বলে।

(গ) ব্যান্ড পদ্ধতি: গাছের এক বা দুই পার্শ্বে ব্যান্ড তৈরী করে সার প্রয়োগ করা হয়। সাধারনত বেশী দুরত্বের সারি করা ফসলে এ পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হয়।

৩. গভীর প্রয়োগ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে সার মাটির সাথে না মিশিয়ে মাটির নির্দিষ্ট গভীরতায় প্রয়োগ করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গভীর প্রয়োগ পদ্ধতিতে **সার** প্রয়োগ করা হয়।

(ক) ড্রিল পদ্ধতি (খ) লাঙ্গল তল পদ্ধতি (গ) মাডবল পদ্ধতি

৪. সেচ পানি পদ্ধতি

জমিতে সেচ প্রদানের সময় সেচের পানির সাথে সার দ্রব্য মিশিয়ে প্রয়োগ করাকে সেচ পানি পদ্ধতি বলে। এটি একটি আধুনিক সেচ পদ্ধতি।

৫. বায়বীয় পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে সার দ্রব্য বায়ু আকারে বা গ্যাসীয় আকারে প্রয়োগ করা হয় তাকে বায়বীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সাধারনত গ্রীন হাউজে ব্যবহার করা হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ গ্রীন হাউজে নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।

৬. সিঞ্চন পদ্ধতি

সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে স্প্রে করে তরল সার উদ্ভিদের পাতায় প্রয়োগ করার কৌশল সিঞ্চন পদ্ধতি নামে পরিচিতি। ইউরিয়া সার কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী সার প্রয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ শেষে প্রতিবেদন লিখবে।

সারসংক্ষেপ

কর্ষণের মাধ্যমে জমিকে ফসল উৎপাদন বা চাষাবাদের অনুকূল করে তোলা হয়। কর্ষনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বীজের উত্তম অণুরোদগম নিশ্চিত করা, মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুনাবলী উন্নত করা। সার দুই ধরনের জৈব সার ও অজৈব সার। গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করাই হল সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তেরর পাশে ($\surd$) টিক চিহ্ন

১. কোন্‌টি ভূমি কর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য?
   (ক) একটি উত্তম বীজতলা তৈরী করা (খ) মাটির ঢিলা ভাঙ্গা
   (গ) মাটিন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা (ঘ) মাটিতে সার প্রয়োগ করা

২. কোন্‌টি আন্তঃ কর্ষণের অপর নাম?
   (ক) প্রাথমিক কর্ষণ (খ) পূর্ব কর্ষণ
   (গ) মাধ্যমিক কর্ষণ (ঘ) ভূমি কর্ষণ

৩. ভিজা মাটিতে কোন অবস্থায় চাষ দিতে হয়?
   (ক) সঠিক তাপমাত্রায় (খ)'জো' অবস্থায়
   (গ) জলাবদ্ধ অবস্থায় (ঘ) ভিজা অবস্থায় যে কোন সময়

৪. সার প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?
   (ক) গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করা (খ) মাটির গুনাগুন বৃদ্ধি করা
   (গ) রোগ - পোকামাকড় নিয়ন্ত্রন করা (ঘ) মাটিতে অনুজৈবিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা

৫. কোন্‌টি রাসায়নিক সংকেত আছে
   (ক) ইউরিয়া (খ) সবুজসার
   (গ) কম্পোস্ট (ঘ) জীবানু সার

(খ) শূন্যস্থান পূরণ

১. ভূমির ------ করার জন্য জমির উপরিভাগ সমান করে তৈরী করা হয়।

২. ভূমি কর্ষণ মাটির ------ ধারন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৩. জৈব সার ব্যবহার চাষের উৎপাদন ব্যয় ----- ।
৪. ব্যান্ড পদ্ধতি হলো ------- পদ্ধতির একটি ধরন।

পাঠ-১.৪ বীজের গুনাগুন নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বীজ কি জানতে পারবেন।
- বীজের বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখতে পারবেন।
- বীজের গুনাগুন প্রভাবকারী উপাদান সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বীজ কি

বীজ হলো ফসল উৎপাদনের অন্যতম গুরুপ্তপূর্ণ মৌলিক উপকরণ এবং এটি দেশের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নত মানের বীজ ব্যবহার না করে ফসল উৎপাদনে শুধুমাত্র সার, কীটনাশক এবং সেচ খরচ বৃদ্ধি করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং, একটি দেশের খাদ্য উৎপাদন গতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে বীজের মান ও গুনাগুনের উপর।

সাধারনভাবে, নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে প্রকৃত বীজ বলে যেমন ধান, গম, ভূট্টা। তবে কৃষি বীজ বলতে সাধারনত: গাছের যে কোন অংশকে বুঝায় যা অনুকূল পরিবেশে মাতৃগাছের অনুরূপ গাছ জন্মাতে সক্ষম হয় যেমন মূল, কান্ড, পাতা।

উন্নতমানের বীজের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ: মান সম্পন্ন ও উন্নতমানের বীজের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

১. বাহ্যিক চেহারা হবে উজ্জ্বল, সুন্দর, সম আকার ও আয়তনের এবং চকচকে যা ক্রেতা বা কৃষকের সহজেই পছন্দ হয়।
২. বীজে কোন নিষ্ক্রিয় পদার্থ যেমন বালি, পাথর, ছোট মাটি, ভাঙ্গা বীজ, বীজের খোসা ইত্যাদি থাকবে না।
৩. ভালো বীজ সজীব, সুপরিপক্ক, পুষ্ট ও অধিক তেজ সম্পন্ন হবে।
৪. বীজ হতে হবে বিশুদ্ধ। আকার, আয়তন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন, জাত অনুযায়ী নিদির্ষ্ট থাকতে হবে।
৫. বীজের আর্দ্রতা নির্ধারিত মাত্রায় থাকতে হবে (ধান, গম, ভূট্টার বেলায় ১২%, ডালজাতীয় শস্যেও বেলায় ৯%, পাট ৯%, সরিষা ৮%)।
৬. বীজ ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত ও নীরোগ হতে হবে।
৭. ভালো বীজ কৌলিতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশুদ্ধ থাকবে, অর্থাৎ তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা থাকবে।
৮. সর্বোপরি বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা নির্ধারিত মানের হতে হবে (সর্বনিম্ন ধানে ৮০%, গমে ৮৫%, ডালশস্যে ৭৫-৮৫%, শাকসবজিতে ৭০-৭৫%)।

উপরে বর্ণিত বীজের গুণাবলী হতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো:

(ক) কৌলিতাত্ত্বিক বা বংশগত বিশুদ্ধতা
(খ) অংকুরোদগম ক্ষমতা
(গ) শারীরিক বিশুদ্ধতা
(ঘ) তুলনামূলক মান বা গুনাগুন

মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহারের সুবিধা:

১. এই বীজ কৌলিতাত্ত্বিক ভাবে বিশুদ্ধ থাকে, ফলে মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহারে একক প্রতি জমিতে ফলন বেশী।
২. এই বীজ ব্যবহারের জমিতে আগাছা বা নিদির্ষ্ট ফসল ছাড়া অনান্য ফসলের উপদ্রব হ্রাস পায়।

৩. এই বীজের জীবনীশক্তি বেশী থাকে এবং রোগবালাই ও পোকা-মাকড় মুক্ত থাকে। ফলে ফসলের ক্ষেতে রোগ, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হ্রাস পায়।
৪. বীজহার/চারা সংখ্যা কম লাগে, যাতে দ্রুত ও সমভাবে বীজ গজাতে পারে।
৫. জন্মানো ফসল বাহ্যিকভাবে একই রকম বা অভিন্ন এবং একই সময়ে পরিপক্কতা লাভ করে।
৬. ফসলের ফলন সহজে অনুমেয় এবং ফসল সংগ্রহ পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের কাজ সহজ হয়।
৭. উৎপাদিত ফসল অধিক মানসম্পন্ন হয় এবং বাজারদর ভালো পাওয়া যায়।

বীজের গুনাগুন প্রভাবিত করার উপাদান সমূহ:

বীজ গুণমান মূলত বীজ গঠনের সময়, বিকাশ, পরিপক্কতা, বৃদ্ধি, ফসল সংগ্রহ, মাড়াই বা নিষ্কাশন, শুকনো, পরিষ্কার, গ্রেডিং, প্যাকিং, স্টোরেজ এবং বিপণনের সময় ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বীজের গুণমানকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন উপাদানগুলি বিস্তৃতভাবে ৪টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা:

(ক) জিনগত (Genetic) উপাদানসমূহ
(খ) পরিবেশগত (Ecological) উপাদানসমূহ
(গ) কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি
(ঘ) ফসল তোলা এবং ফসল সংগ্রহত্তোর কাজ সমূহ

জিনগত উপাদান: বীজ উৎপাদন কালীন সময় পরিবেশগত ও অনান্য কারণগুলির সম্মিলিত প্রভাবের কারণে বীজের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা বা প্রজাতির বিশুদ্ধতা হ্রাস পায়। এটি বিষেশত: এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যেখানে একই উৎস হতে বীজ বছরের পর বছর অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।এছাড়াও, সংরক্ষণাগারের প্রতিকূল পরিবেশ বীজে ক্রোমসোমাল ক্ষয় এবং মিউটেশন ঘটিয়ে বীজের জিনগত পরিবর্তন বা ক্ষয় করে থাকে।

পরিবেশগত উপাদান: উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং বীজের গুনাগুন কেবলমাত্র জিনগত কারণ দ্বারাই প্রবাবিত হয না, বীজ গঠনের সময়, পরিপক্কতা এবং বৃদ্ধির সময় বিদ্যমান পরিবেশ দ্বারাও সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়। বীজের গুণমানকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত কারণগুলির মধ্যে রয়েছে: মাটি, অভিযোজনযোগ্যতা, বাতাসের বেগ এবং বৃষ্টিপাত, হালকা তীব্রতা এবং তাপমাত্রা, পরাগায়নের সময় পোকামাকড়ের কার্যকারিতা পোকামাকড় এবং রোগজীবাণুর প্রার্দুভাব।

কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি: বীজ উৎপাদন জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগুলি সাধারন ফসল উৎপাদন কলাকৌশল হতে আলাদা। বিভিন্ন কৃষি পরিচর্যা যেমন জমি তৈরী, বীজ বপন/ চারা রোপণ, সুষম সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, পোকামাকড় এবং রোগ জীবাণু নিয়ন্ত্রন, আগাছা ও অবাঞ্চিত গাছ অপসারণ ইত্যাদি বীজের গুনাগুন নিয়ন্ত্রনে গুরুপ্তপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।

ফসল তোলা এবং ফসল সংগ্রহত্তোর কাজ সমূহ: বীজ ফসল সংগ্রহ এবং সংগ্রহত্তোর প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিষ্কারকরন ও গ্রেডিং, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রন, প্যাকিং, লেবেলিং, সিলিং, স্টোরেজ ইত্যাদি কাজসমূহ সর্তকতার সাথে তদারকি করা মানসম্পন্ন বীজ পাওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী।

বীজের মানের অবনতি

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিভিন্ন স্তরে নানা প্রক্রিয়ায় বীজের তেজ ও মানের অবনতি ঘটার কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) বীজ ফসল কাটার পূর্বে ঃ বীজ ফসল সংগ্রহ বা মাঠে ফসল থাকা অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বীজের তেজ বা মানের অবনতি ঘটতে পারে। মাঠে থাকা অবস্থায় যে সব কারণে বীজ মানের অবনতি ঘটে তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) বৃদ্ধি পর্যায়ে ঃ বীজের বৃদ্ধি পর্যায়ে যদি অতিরিক্ত শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজমান থাকে, তবে বীজের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং দ্রুত পরিপক্কতা লাভ করে। এ অবস্থায় বীজ আকারে ছোট, নিম্ন তেজ সম্পন্ন এবং অপুষ্ট হয়ে থাকে।

(খ) বীজ পরিপক্কতা সময়কালে ঃ বীজ পরিপক্কতা লাভকালে অতিরিক্ত শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া থাকলে বীজ দ্রুত শুকাতে থাকে। যার দরুন, বীজ আবরনে ফাটল, ভ্রুণে এবং বীজ ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে, যা বীজে মানের অবনতি ঘটায়। এ ধরনের বীজ অঙ্কুরোদগমকালে বিভিন্ন রোগজীবানু দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে এবং অস্বাভাবিক চারা জন্ম দেয়।

(গ) বীজ পরিপক্কতা লাভের পর ঃ বীজ পরিপ্লকতা লাভের হঠাৎ আর্দ্রতা বেড়ে গেলে বা বৃষ্টিপাত হলে বীজ গাছে থাকা অবস্থায় গজিয়ে যেতে পারে। কোন কারণে যদি বীজ ফসল কাটতে দেরী হলে কোন কোন পরিস্থিতিতে চরম পারিপার্শ্বিক অবস্থা বীজের মান নষ্ট করতে পারে।

(২) বীজ ফসল কর্তন থেকে সংরক্ষণ পূর্ব পযর্ন্ত ঃ বীজ ফসল কাটা ও মাড়াই কালে এবং বীজ শুকানো ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বীজ ফসল কর্তনের সময় আঘাতপ্রাপ্ত ইত্যাদি নানাভাবে বীজের মান নষ্ট হতে পারে।

(৩) বীজ সংরক্ষণকালে ঃ সঠিকভাবে বীজ সংরক্ষণ করতে না পারলে উন্নতমানের বীজেরও অবনতি হতে পারে। সংরক্ষণকালে বীজের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াসমূহের মাত্রার উপর বীজের মান নির্ভর করে। আবার এই শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াসমূহের মাত্রা নির্ভর করে সংরক্ষণ কালীন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপর। সাধারনত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার বৃদ্ধির সাথে সাথে বীজের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াসমূহের মাত্রাও বেড়ে যায়, যার দরুন বীজের তেজ নষ্ট হতে থাকে। সুতরাং বীজের তেজ ও মান দীর্ঘস্থায়ী রাখার জন্য বীজ এমন অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে যেখানে বীজের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াসমূহের মাত্রা থাকবে নিম্নতম।

শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণিতে বীজের গুনাগুন প্রভাবকারী উপাদান ব্যাখ্যা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ফসল উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বীজ। মান সম্পন্ন বীজের চেহারা উজ্জল, সমআকার হবে এবং ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগজীবাণু মুক্ত হতে হবে। বীজের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে এমন উপাদান সমূহ হল জীনগত পরিবেশগত, কৃষি প্রযুক্তি, ফসল তোলা এবং সংগ্রহত্তোর কাজ সমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তেরর পাশে (√) টিক চিহ্ন

১. কোনটি কৃষি বীজ?
   (ক) আখ কান্ড (খ) ধান
   (গ) গম (ঘ) ভূট্টা

২. কোনটি ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য?
   (ক) কৌলিতাত্তিক ভাবে বিশুদ্ধ হবে (খ) সজীব ও সুপরিপক্ক হবে
   (গ) উজ্জ্বল ও রোগমুক্ত হবে (ঘ) উপরের সবগুলো গুনাগুনসহ

৩. দানা ফসলে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা কী পরিমাণ থাকতে হবে?
   (ক) ৯% (খ) ১২%
   (গ) ১৬% (ঘ) ১৮%

৪. বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে কত থাকতে হবে?
   (ক) ৭০- ৭৫% (খ) ৭৫- ৮০%
   (গ) ৮০ - ৯০% (ঘ) ৬০- ৭০%

৫. কোনটি বীজ সংরক্ষণকালীন গুরুপ্তপূর্ণ?

(ক) সঠিক আর্দ্রতা (খ) সঠিক তাপমাত্রা
(গ) সঠিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা (ঘ) গ্রেডিং ও লেবেলিং

পাঠ-১.৫ ফসল পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফসলের পরিচর্যা কি তা জানতে পারবেন।
- সার প্রয়েগে বিবেচ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পানি সেচ ও নিস্কাশন, আগাছা দমন, চারা পাতলাকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ উল্লেখ করতে পারবেন।

ফসল পরিচর্যা

উন্নত বীজ বপন কখনই ভালো ফলন নিশ্চিত করে না। ভালো ফলনের জন্য প্রয়োজন বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহের আগ পর্যন্ত সকল প্রকার অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন: সার প্রয়োগ, পানি সেচ ও নিষ্কাশন, চারা পাতলাকরণ, আগাছা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ইত্যাদি কাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা।

(ক) সার প্রয়োগ

যেসব দ্রব্য উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ করে এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ বা বৃদ্ধি করে তাকে সার বলে। যেমন: ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি। যে সকল ফসলের দেহের গঠন বড় এবং ফলন বেশী তাদের খাদ্য চাহিদাও বেশী। পক্ষান্তরে, যেসব ফসলের দেহের গঠন ছোট এবং ফলন কম তাদের খাদ্য চাহিদাও কম। যেমন ধান গাছের তুলনায় ভূট্টাতে সার বেশী লাগে, তেমনি ডাল জাতীয় ফসলে সার কম লাগে। ফসলের স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশী হওয়ায় উফশী জাতে সার বেশী লাগে। সার প্রয়োগে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

(১) **ফসলধারা ঃ** ফসলধারা বলতে এক বছরে একটি একক জমিতে ধারাবাহিকভাবে যে ফসল সমূহ চাষ করা হয়। যা সার প্রয়োগের জন্য গুরুপ্তপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিশেষ করে বর্তমান ফসলের পূর্ববর্তী ফসল কি ছিল তা জানা জরুরী। সাধারনত ডাল ও শুটি জাতীয় ফসল এর পরবর্তী ফসলে সার কম লাগে। কিন্তু ভূট্টা, ধান, গম, চীনা, কাউন ইত্যাদি ফসলের পরবর্তী ফসলে সার বেশী লাগে।

(২) **মাটি উর্বরতা** ঃ সাধারনত উর্বর মাটিতে সার কম লালে এবং কম উর্বর বা অনুর্বর জমিতে সার বেশী লাগে।

(৩) **উৎপাদন মৌসুম ঃ** সার প্রয়োগে উৎপাদন মৌসুম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। খরিপ মৌসুমের তুলনায় রবি বা শীত মৌসুমে ফসলের ফলন বেশী হয়। যেমন আউশ ও আমন ধানের চেয়ে বোরো ধানের ফলন বেশী হয়ে থাকে। আবার খরিপ মৌসুমের ভূট্টার চেয়ে রবি মৌসুমে উৎপাদিত ভূট্টার ফলন বেশী হয়। এ কারণে রবি মৌসুমে ফসলের খাদ্য চাহিদা বেশী থাকে। তাই খরিপ মৌসুমের তুলনায় রবি বা শীত মৌসুমে বেশী মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

(৪) **পানি ব্যবস্থাপনা (বৃষ্টি নির্ভর/ সেচযুক্ত)** ঃ বৃষ্টি নির্ভর চাষে ফসলের তুলনায় সেচযুক্ত চাষে ফলন বেশী হয়। বৃষ্টি নির্ভর চাষে ফসলের ফলন কম হয় বিধায় ফসলের খাদ্য চাহিদাও কম থাকে, যার দরুন সারের পরিমানও কম লাগে। পক্ষান্তরে, সেচযুক্ত চাষে ফসলের ফলন বেশী হয় বিধায় ফসলের খাদ্য চাহিদাও বেশী থাকে, ফলে সারও বেশী লাগে।

(৫) **জৈব সার ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশ ব্যবহার** ঃ জৈব সার, খামারজাত সার, সবুজ সার ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশে ফসলের প্রয়োজীনয় সকল প্রকার খাদ্যেপাদান অল্প পরিমানে থাকে। সুতরাং এই জৈব সার ফসলের জমিতে ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সার কম লাগে।

(৬) **রাসায়নিক সারের ধরন ও প্রকৃতি** ঃ ফসলের জমিতে সার প্রয়োগে ক্ষেত্রে সারের ধরন ও প্রকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যেমন ইউরিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী সার এবং জমিতে প্রয়োগের এক মাসের মধ্যেই এর কার্যকারিতা প্রায় শেষ হয়ে যায়। তাই এই সার একবারে প্রয়োগ করা যায় না; ফসল ভেদে সাধারনত ২-৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমিতে তেমন একটা নষ্ট হয় না এবং এদের কার্যকারিতা দীর্ঘদিন বজায় থাকে। তাই এসব সার ফসলের চাহিদা মোতাবেক বপন বা রোপনের সময় একবারে প্রয়োগ করা যায়।

(খ) পানি সেচ ও নিষ্কাশন

সেচ: ফসলের ক্ষেতে ফসলের প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করাকে সেচ বলা হয়। বাংলাদেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও এখানে সেচের প্রয়োজন হয়। কেননা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের সব অঞ্চলে এক রকম নয়, তেমনি প্রত্যেক মাসেও সমপরিমাণ নয়। বাংলাদেশে ফসলের জমিতে সেচের জন্য গভীর এবং অগভীর উভয় ধরনের নলকূপ ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষ করে শুকনো বা রবি মৌসুমে। সাধারনত উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি খরার প্রতি অতি সংবেদনশীল হওয়ার কারনে মাঝে মধ্যেই সেচের প্রয়োজন হয়। এ কারণে নিরবিচ্ছন্নভাবে উচ্চ ফলন লাভ করার জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচ প্রয়োগ করা হলো একটি পূর্বশর্ত। জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আউশ ও আমন ধানের জন্য অনাবৃষ্টির সময়েও সম্পূরক সেচের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেচের পানির উৎসগুলো হলো নদীনালা, খালবিল, পুকুর, কূপ, নলকূপ, গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ।

চিত্র ১.৫.১ : পানি সেচ

সেচের প্রয়োজনীয়তা

ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য পানি অপরিহার্য। এজন্য কৃষি কাজে পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. সেচের পানি মাটিতে সঞ্চিত খাদ্যোপাদান সমূহকে দ্রবীভূত করে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে।
২. সেচের পানি জৈব পদার্থের দ্রুত পচন ঘটিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
৩. মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. সেচের পানি মাটিতে উপকারী অণুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
৫. জমির 'জো' অবস্থা আনতে সেচের প্রয়োজন।
৬. বপনকৃত বীজের জন্য পর্যাপ্ত আদ্রর্তা সরবরাহ করে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত করে।
৭. সেচ দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।
৮. সেচের মাধ্যমে একই জমিতে বছরে একের অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়।
৯. আগাছা দমন, বীজতলায় চারা উৎপাদন ও চারা উত্তোলনের জন্য সেচ প্রয়োজন।

১০. সর্বোপরি ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম।

পানি নিষ্কাশনঃ

ফসলের ক্ষেতের মাটি সেচ বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সম্পৃক্ত (Saturated) হওয়ার পর মুক্ত বা অতিরিক্ত পানি অপসারণের প্রক্রিয়াকে নিষ্কাশন বলে।

পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা

জমি হতে সময়মত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ফলে ফসলের যে উপকার হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. অতিরিক্ত পানি অপসারণ করলে মাটিতে বায়ু চলাচল সুগম হয়, ফলে গাছের মূলের বৃদ্ধি ভালো হয়। অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে গাছের মূল মারা যায়। পানি নিস্কাশন করলে গাছ সতেজ হয়, পোকামাকড় ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ সহজে প্রতিহত করা যায়।
২. পানি নিস্কাশনের ফলে পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বাড়ে।
৩. অতিরিক্ত পানি সরে গেলে অক্সিজেনের পরিমান বাড়ে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন গৌন পুষ্টি উপাদান যেমন ম্যাংগানিজ, জিংক, কপারের বিষাক্ততা কমে যায়।
৪. পানি নিস্কাশনের ফলে মাটিতে উপকারী ব্যাকটেরিয়া যেমন নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ব্যাকটেরিয়া, জৈব পদার্থ বিয়োজনকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় বলে মাটিতে পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য হয়।
৫. পানি অপসারণ করলে মাটির তাপমাত্রা বাড়ে যা বীজ অংঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত করে।
৬. শস্য উৎপাদন মৌসুমের ব্যপ্তিকাল হ্রাস করা সম্ভব হয়। কারণ জমি হতে অতিরিক্ত পানি সরালে আগাম অথবা সময়মত ফসল লাগানো সম্ভব হয় এজন্য পরবর্তী ফসল ও সময়মতো লাগানো যায়।
৭. অধিকাংশ ফসলই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না যেমন তোষা পাট, মরিচ, তুলা, বেগুন ইত্যাদির জন্য পানি নিস্কাশন অত্যাবশ্যক।
৯. জমিতে অতিরিক্ত পানির জন্য গাছের মূল ঠিকমত বিস্তার লাভ করতে পারে না। পরবর্তীতে মাটির উপরিস্তর শুকিয়ে গেলে অগভীর মূলের জন্য নিচের স্তরের পানি নিতে পারে না। যেমন আমন ধানের ক্ষেত্রে এ সমস্যা দেখা যায়।
১০. মাটিতে উদ্ভিদের জন্য বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের উৎপাদন কম হয়।

(গ) চারা পাতলাকরণ

ফসলের জমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফেলাকে চারা পাতলাকরণ বলা হয়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পরিমিত জায়গা। প্রয়োজনের তুলনায় জায়গা কম হলে যেমন সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে না, তেমনি জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় না। যে সকল ফসল উৎপাদনে বীজ বপনের প্রয়োজন হয়, সেখানে বিভিন্ন কারণে বীজহার কিছুটা বেশী দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গজানো চারা উঠিয়ে ফেলতে হবে। কেননা, চারার সংখ্যা বেশী হলে ফলন এবং গুনগত মানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(ঘ) আগাছা দমন

কোন স্থানে অবাঞ্ছিতভাবে জন্মানো গাছকে আগাছা বলে যেমন শ্যামা, দূর্বা, চাপড়া, বথুয়া ইত্যাদি। ফসলের কাঙ্খিত বৃদ্ধি এবং ফলনের জন্য আগাছা দমন কৃষিতে অতিব গুরুপ্তপূর্ণ। আগাছার বৈশিষ্ট্য হলো আগাছা সাধারণত অসংখ্য বীজ উৎপাদন করে, বীজ আকারে ছোট ও ওজনে হালকা হয় এবং বীজ প্রতিকূল অবস্থায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে।

আগাছা প্রধানত দু'ধরনের - সত্যিকারের আগাছা বা নিরেট আগাছা যা কোন স্থানে অবাঞ্ছিতভাবে জন্মায় এবং দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক যা আসলে আগাছা নয়, ফসল গাছ। যেমন- ধান ক্ষেতে পাট, তেমনি পাট ক্ষেতে ধান গাছ আপেক্ষিক আগাছা।

প্রতিরোধ, দমন ও উচ্ছেদ এই তিনটি নীতিমালার মাধ্যমে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তবে আগাছা

দমনের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে যথা ঃ (ক) পরিচর্য়া পদ্ধতি (খ) রাসায়নিক পদ্ধতি, (গ) জৈবিক পদ্ধতি।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল সংগ্রহ

ফসলের জমি হতে পরিপক্কতা বা ব্যবহারোপযোগীতা লাভের পর প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রহনোপযোগীতা বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফসলের ফলন বা উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াকে ফসল সংগ্রহ বলা হয়। ফসল সংগ্রহ মূলত অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন ফসল মৌসুম, ফসলের জাত, পরিপক্কতার সময় ইত্যাদি। তবে, যে উদ্দেশ্যেই ফসল উৎপাদন করা হউক না কেন উপযুক্ত সময়ের আগে বা পরে ফসল সংগ্রহ করা হলে বিভিন্নভাবে ফলন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অতিমাত্রায় পরিপক্কতার জন্য ধান, গমের শীষ ভেঙ্গে পড়তে পারে অথবা বীজ ঝরে পড়তে পারে। ডাল জাতীয় ফসল যেমন মসুর, খেসারী, ছোলা এবং তৈল জাতীয় ফসল যেমন সরিষা, তিল, তিসি ইত্যাদির পড (ফল) ফেটে যায় এবং বীজ ঝরে পড়ে। তাই, সঠিক সময়ের মধ্যে ফসলের ফলন সংগ্রহ করার ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। ফসলের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ফসল সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

(ক) গাছের গোড়া কেটে সংগ্রহঃ ফসল পরিপক্কতা লাভের পর দা, কাঁচি বা কোদাল দিয়ে গাছের গোড়া কেটে সংগ্রহ করা হয়। সাধারনত তন্ডুল ফসল যেমন ধান, গম ইত্যাদি ফসলের গোড়ার কিছু ওপরে কেটে ফলন সংগ্রহ করা হয়। তবে যে সকল ফসলের কান্ড ফলন সহায়ক সে সব ফসলের ক্ষেত্রে কান্ড মাটির খুব কাছাকাছি কাটা উচিত।

(খ) গাছ মূলোৎপাটন করে/উপড়িয়ে সংগ্রহঃ ডাল জাতীয় ফসল যেমন মসুর, খেসারী, ছোলা ইত্যাদি এবং তৈল জাতীয় ফসল যেমন সরিষা, তিসি, তিল ইত্যাদিও গাছ মূলোৎপাটন করে ফলন সংগ্রহ করা হয়।

(গ) মাটি খুড়ে ফসল সংগ্রহঃ যে সকল ফসল মাটির নিচে হয় যেমন আলু, মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম ইত্যাদি ফসল লাঙ্গল বা কোদাল বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়ে মাটি খুড়ে সংগ্রহ করা হয়।

(ঘ) চয়ন করে সংগ্রহঃ যেসব ফসল একসঙ্গে পরিপক্ক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিপক্ক হয় সেসব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী, তবে কিছুটা ব্যয়বহুল যেমন তামাক,তুলা, ভূট্টা, মটরশুটি ইত্যাদি।

ফসল সংরক্ষণ

ফসল সংগ্রহের পর ফসলের ফলন বা উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ বা গুদামজাত করার পূর্বে মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ইত্যাদি কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে হবে। ফসল সংরক্ষণ করা অর্থাৎ গুদামজাতকরণের দুটো প্রধান শর্ত হলো নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা এবং নিয়ন্ত্রিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা। এদের যে কোন একটিকে নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে গুদামজাতকৃত পণ্যেও গুনগত মান ঠিক রাখা যাবে না। গুদামজাত পণ্যেও গুনগতমান অক্ষুন্ন রাখতে হলে তাপমাত্রা ৩ - ১০° সে এর মধ্যে থাকা দরকার। বীজ ভালোভাবে শুকানো না হলে উচ্চ তাপমাত্রায় বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হবে অথবা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে যাবে। গুদাম ঘরটি পাকা হওয়া প্রয়োজন। পাকা মেঝেতে কাঠের বা বাঁশের মাচা বা তাক তৈরী করে এতে বস্তা ভর্তি করে বীজ রাখা হলে বীজের গায়ে মেঝের বা পার্শ্ব দালানের আর্দ্রতা লাগতে পারবে না। বীজ গুদামজাত করার আগে কীটনাশক এবং রোগনাশক রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে শোধন করে নেয়া ভাল। গুদামজাত করার পর বীজ মাঝে মধ্যে শুকিয়ে আবার বস্তায় ভরে গুদামে রাখতে হবে।

গুদামজাত পণ্যের মান ঠিক রাখার জন্য একটি থাম্বরুল (Thumb rule) হলো - তাপমাত্রা (ডিগ্রী ফারেনহাইট) এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার যোগফল ১০০ এর বেশী হবে না। অর্থাৎ আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি ৬০% হয় তাহলে তাপমাত্রা ৪০° ফা. এর বেশী নয়। অথবা এর উল্টোটাও হতে পারে - তাপমাত্রা ৬০ ফা. আর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০%।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ফসলের জমিতে কিভাবে সেচ প্রদান করা হয় তা সরে জমিনে

	পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিবে।

সারসংক্ষেপ

ভলো গুণাগুণ সম্পন্ন বীজ বপন করলেই আশানুরূপ উৎপাদন হবে তা কিন্তু নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিচর্যা যেমন: সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, আগাছা, পোকামাকড় ও রোগদমন, চারা পাতানী করণসহ অন্যান্য পরিচর্যা। এছাড়া ফসল সঠিক সময়ে সংগ্রহ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণের পূর্বে মাড়াই, ঝাড়াই ও শুকানোর কাজটি করতে হবে। সবশেষে নিষ্টি আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

(ক) সঠিক উত্তেরর পাশে (√) টিক চিহ্ন

১. কোন্ ফসলে সার কম লাগে?
   (ক) ভূট্টা (খ) ধান
   (গ) কাউন (ঘ) মসুর

২. কোন্ সারের অপচয় হওয়ার সম্ভবনা বেশী?
   (ক) ইউরিয়া সার (খ) কেচোঁ সার
   (গ) টিএসপি সার (ঘ) খামারজাত সার

৩. জৈব সারে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যেপাদানের পরিমান কেমন থাকে?
   (ক) কম (খ) বেশী
   (গ) খুব বেশী (ঘ) কোনটিই নয়

৪. জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় কেন?
   (ক) 'জো' অবস্থা আনার জন্য (খ) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করার জন্য
   (গ) অণুজৈবিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য (ঘ) উপরের সব গুলোর জন্য

৫. কোন্ ফসল মূলোৎপাটন করে সংগ্রহ করা হয়?
   (ক) ভূট্টা (খ) ধান
   (গ) কাউন (ঘ) মসুর

(খ) সত্য/মিথ্যা যাচাই

১. রবি মৌসুমে ফসল চাষে সারের প্রয়োজন বেশী।
২. জৈব সার ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ কমে যায়।
৩. উচ্চ ফলনশীল জাত খরা সহনশীল হয়ে থাকে।
৪. আগাছা বীজ সাধারনত ছোট ও হালকা হয়ে থাকে।
৫. সংরক্ষণাগারে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বীজে কোন প্রভাব ফেলে না।

পাঠ-১.৬ ব্যহারিক ঃ সবুজ সার তৈরী

জমিতে উদ্ভিদ জন্মিয়ে তা সবুজ ও নরম অবস্থাই আবার সে জমিতে মিশিয়ে এবং পঁচিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে সবুজ সার বলে। এই প্রক্রিয়াকে সবুজসারকরণ এবং উদ্ভিদগুলোকে সবুজ সার ফসল বলে।

চিত্র- ১.৬.১ : সবুজ সার ধৈঞ্চা

সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার উপযোগী গাছসমূহঃ

সবুজ সার তৈরী করার মূল উদ্দেশ্য হলো মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করা। যে সকল গাছের মূলে গুটি হয়, কচি অবস্থায় কান্ড ও পাতা রসালো হয়, শিকড় মাটির গভীরে যেতে পারে, অল্প পরিচর্যায় দ্রুত বর্ধনশীল এবং অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ উৎপাদনক্ষম, সবুজ সার তৈরীতে ঐসব উদ্ভিদ বেছে নেওয়া হয়। যেমন ধৈঞ্চা, শন, বরবটি, সীম, খেসারী, মুগ, মাসকালাই, সয়াবিন, মসুর, ছোলা, মটর ইত্যাদি। সাধারনত ধৈঞ্চা ও শন সবুজ সার হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে মাঝারি উচুঁ জমিতে শন এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে ধৈঞ্চা সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সবুজ সার ফসলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপঃ

(ক) গাছ দ্রুত বর্ধনশীল হবে এবং অনুর্বর মাটিতে জন্মানোর ক্ষমতা থাকতে হবে।
(খ) গাছের কান্ড নরম ও দ্রুত পচনশীল হতে হবে।
(গ) গাছ তাড়াতাড়ি পরিপূর্ণতা লাভ করার সক্ষমতা থাকবে।
(ঘ) গাছের অনেক ডালপালা ও পাতা থাকবে।
(ঙ) গাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকবে। এজন্য মাটির নিচের স্তর থেকে খাদ্যেপাদান শিকড়ের মাধ্যমে শোষণ করে উপরে নিয়ে আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা সবুজ সারের সাথে মাটির উপরিস্তরের সঙ্গে মিশে ফসলের ব্যবহারোপযোগী হয়।
(চ) যতদুর সম্ভব লিগোমিনোসী পরিবারভুক্ত হবে।

সবুজ সার ব্যবহারের উপকারিতাঃ

সবুজ সার মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে ফলে গাছের প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদানের পরিমান বৃদ্ধি পায়। মাটিকে উর্বর করে ও মাটির ভৌত গুনাবলীর উন্নতি সাধন করে। এই সার মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিকে ঝুরঝুরে করে এবং মাটির ভিতর বায়ু চলাচল করার সুযোগ পায়। যার দরুন গাছের শিকড় সহজেই মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং গভীরে থাকা পানি ও খনিজ উপাদান গ্রহণ করতে পারে। এই সার ব্যবহারে মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে বিধায় মাটির উপকারী অণুজীব সমূহের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গুরুপ্তর্পূণ ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক লাঙ্গল কেঁচোর সংখ্যা, অবস্থান ও কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। ঘনভাবে জন্মানোর জন্য আগাছার উপদ্রব কমানো সম্ভব এবং ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। ধৈঞ্চা সবুজ সার হিসাবে প্রতি হেক্টরে ২০ টন জৈব সার এবং ৬০-৭০ কেজি নাইট্রোজেন যোগ করে। শন পাটের বেলায় জৈব পর্দাথের পরিমান হয় ২০ টন এবং নাইট্রোজেন ৪০ কেজি। কাজেই দেখা যায় যে, সবুজ সার ব্যবহারে ফসলের বৃদ্ধি ও ফলন অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

প্রস্তুত প্রণালী

ধৈঞ্চা বা শনপাট গাছ ব্যবহার করে সবুজ সার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

(১) জমি নির্বাচন

সব ধরনের জমিতে ধৈঞ্চা বা শনপাট জন্মায়, তবে ধৈঞ্চা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে এবং শনপাট অপেক্ষাকৃত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে ভালো জন্মায়।

(২) বপন মৌসুম

সাধারণত: খরিপ মৌসুমে ধৈঞ্চা ও শনপাট চাষ করা হয়, তবে পচানোর মতো পানি পাওয়া গেলে রবি মৌসুমেও চাষ করা যায়। বৈশাখ - জ্যেষ্ঠ মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। খরিপ মৌসুমে ধৈঞ্চা বা শনপাঠ সবুজসার হিসাবে চাষ করলে সে জমিতে অনেক সময় আউশ ধান বা পাট চাষ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে রোপা আমন ধান রোপন করতে হবে।

(৩) উৎপাদন পদ্ধতি

সবুজ সার ফসলের জন্য দুইবার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। সাধারণত ধৈঞ্চা ও শনপাট সবুজ সার হিসাবে চাষে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না, তবে শিকড় সংখ্যা ও শিকড়ে গুটি বৃদ্ধির জন্য হেক্টরপ্রতি ৫-১০ কেজি টিএসপি সার ব্যবহার করা যায়। ধৈঞ্চা এবং শনপাট চাষে হেক্টরপ্রতি ৪৫- ৫০ কেজি বীজ জমিতে ছিটিয়ে বপন করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজে ২০-৩০ গ্রাম জীবাণু সার মিশ্রিত করে বপন করা হলে ফলন ভালো হয় এবং শিকড়ে গুটির সংখ্যাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বীজ বপনের পর জমিতে তেমন কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তবে জমিতে রসের পরিমান কমে গেলে হালকা সেচ দিতে হবে। বীজ বপনের ৬ -৮ সপ্তাহ পর গাছ ১-১.৫ মিটার লম্বা হলে এবং ফুল আসার পূর্বে দা বা কাঁচি দিয়ে এলোপাথারিভাবে কেটে ২/৩ দিনের ব্যবধানে লাঙ্গল দিয়ে আড়াআড়ি চাষ দিয়ে গাছগুলোকে ভালো ভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সে সময় জমিতে ৩ - ৫ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো পানি থাকলে ১০-১৫ দিনেই গাছ পচে সারে পরিণত হবে। সবুজ সার যে জমিতে জন্মানো হয় সাধারণত সে জমিতেই গাছগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে এক জমিতে গাছ জন্মিয়ে অন্য জমিতেও সবুজ সার প্রয়োগ করতে পারেন।

পাঠ-১.৭ ব্যবহারিক ঃ বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

অঙ্কুরোগদম পরীক্ষা ঃ কোন বীজের সুপ্ত ভ্রূণ জাগ্রত হওয়ার নাম অঙ্কুরোদগম। বীজের মান যাচাই করার জন্য অর্থাৎ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সুস্থ চারা বের হবে কিনা তা জানার জন্য অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা হয়। অঙ্কুরিত বীজ সংখ্যা তাত্ত্বিকভাবে শতকরা হারে নির্ণয় করে অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উদাহরন হিসাবে বলা যায় ১০০টি বীজ গজাতে দিলে কতটি বীজ গজিয়েছে বের করলেই বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার শতকরা হার বের হয়ে আসে। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করতে হয়।

এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

(১) বীজ নমূনার স্বাভাবিক চারা উৎপাদনকারী বীজের সংখ্যা (%) নির্ণয়।
(২) বীজের নমুনায় অনান্য উপকরণ অংশের তুলনায় স্বাভাবিক চারা উৎপাদনকারী বীজের পারস্পরিক পরিমাণ নির্ণয়।
(৩) বপনের জন্য বীজহার ও বীজের বাজার মূল্য নির্ধারণ।
(৪) বীজের প্রকৃত মান নির্ধারণ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন

(১) বীজ অঙ্কুরোদগম যন্ত্র
(২) বোর্ড (সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য)
(৩) মাটি ও বালির পাত্র
(৪) তোয়ালে, চোষ কাগজ, পেট্রিডিস
(৫) নমুনা রাখার ট্রে ইত্যাদি।

কাজের ধারা

(ক) বিশুদ্ধ বীজের অংশ থেকে অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার জন্য বীজ নমুনা নিন।
(খ) অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে ৪০০টি বীজ নিন এবং চার ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগে ১০০টি বীজ নিতে হবে, এতে করে পরীক্ষা নির্ভূল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
(গ) এবার উপযুক্ত পাত্রে যে কোন একটি অঙ্কুরোদগম মাধ্যম যেমন চোষ কাগজ, ফিল্টার কাগজ, বালি, তোয়ালে ইত্যাদি এর উপর প্রয়োজনীয় পানি ও বীজ নিন। বীজ স্থাপনের সময় কমপক্ষে বীজের সমান মাপের ১-৫ গুন স্থান (বীজ হতে বীজ) ফাঁকা রাখুন।
(ঘ) পেট্রিডিস ব্যবহার করা হলে বীজ বসানোর পর পেট্রিডিসটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন। এতে পানির বাস্পায়ন কম হয়। সুবিধা থাকলে পেট্রিডিসগুলি নিয়ন্ত্রিত অঙ্কুরোদগম যন্ত্রে রাখুন।
  (১) পেট্রিডিসে নেওয়া বীজের নাম, জাত, সংখ্যা ও পরীক্ষার তারিখ কাগজে লিখে রাখুন।
  (২) প্রতিদিন লক্ষ্য রাখুন যেন পানি শুকিয়ে না যায়। পানি শুকিয়ে গেলেই পূনরায় পানি দিন।
  (৩) পূর্ব নির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট দিনে অংকুরিত বীজের চুড়ান্ত সংখ্যা নির্ণয় করুন।
  (৪) অংকুরিত বীজের সংখ্যা নির্ণয়ে কেবল স্বাভাবিক চারার সংখ্যা নির্ণয় করুন।

অঙ্কুরোদগম হার নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$$\% \text{ অঙ্কুরোগদম} = \frac{\text{স্বাভাবিক চারা উৎপাদনকারী বীজের সংখ্যা}}{\text{অঙ্কুরোদগমের জন্য বসানো বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$$

প্রথম গণনার সময় স্বাভাবিক বীজগুলো (যা গজিয়েছে) গণনা করুন এবং মৃত বা অস্বাভাবিক বীজগুলো (যদি নিহ্নিত করা যায়) সরিয়ে ফেলুন বা ফেলে দিন। প্রাথমিক গণনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখুন। এরপর দ্বিতীয় বা চুড়ান্ত গণনা খুব সর্তকতার সাথে করুন। কেননা, এ সময় যদি সুপ্ত বীজের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় তবে চুড়ান্ত গণনার তারিখ আরও ৫ দিন বর্ধিত করা যেতে পারে। বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গার জন্য রিয়াজেন্ট যেমন পটাশিয়াম নাইটেট্র অথবা জিবরালিক এসিড প্রয়োগের পরেও যদি কোন বীজ না গজায়, তবে সে বীজগুলো মৃত/শক্ত বীজ হিসাবে ধরে নিতে হবে।

স্বাভাবিক চারার বৈশিষ্ট্য ঃ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে মোটামুটিভাবে চারাকে স্বাভাবিক চারা বলা যেতে পারে।

(ক) চারা সুস্থ ও বর্ধিষ্ণু হবে।
(খ) চারার শিকড় সুউন্নত হবে।
(গ) ইপিকোটাইল ও হাইপোকোটাই অক্ষত থাকবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(ঘ) গ্রামিনি পরিবারের চারার ক্ষেত্রে কলিওপটাইল ও প্রাথমিক পাতা সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে যেমনঃ ধান, গম)।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুল্লাহ এর তিন একর জমি আছে। তিনি জমিতে সবসময় ভালোমানের বীজ ব্যবহার করেন। কিন্তু মৌসুম শেষে আশাণুরূপ ফল পান না। সেজন্য একদিন তিনি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার দারস্থ হলেন। কৃষি কর্মকর্তা ফসলের বীজ বোনা থেকে পরিচর্যা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিলেন সে মোতাবেক পরের বছর ভালো ফলন পেলেন।

১। ফসল কি?
২। ফকল উৎপাদন মৌসুম গুলি উল্লেখ করুন।
৩। ফসলের সার ব্যবস্থাপনা সঠিক উপায় বিশ্লেষণ করুন।
৪। উদ্দীপকের আলোকে ফসল পরিচর্যা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। ক	৫। গ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২	ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	৪। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩	ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। ক	৫। ক
		১। ক্ষয়রোধ	২। পানি	৩। কমায়	৪। স্থানীয় প্রয়োগ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪	ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। গ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ	৫। ঘ
		১। সত্য	২। সত্য	৩। মিথ্যা	৪। সত্য	৫। মিথ্যা